Vol. 7 | No. 2 | 1963

Check for updates

সাহিত্য পত্রিকা

journal.bangla.du.ac.bd

আবেরুণীর ভারত-তত্ত্ব

Volume	7
Issue	2
Year	1963
ISSN	0558-1583
eISSN	3006-886X
Author(s)	আবু মহামেদ হবিবুল্লাহ
Published online	December 16, 1963
DOI	10.62328/sp.v7i2.1
Link to article	https://doi.org/10.62328/sp.v7i2.1
Pages	1-25
Publisher	University of Dhaka
Copyright	সাহিত্য পত্রিকা
Designed and Developed by	Zobayer Abdullah

সাহিত্য [illegible]
সপ্তম বর্ষ : দ্বিতীয় সংখ্যা
শীত : ১৩৭০

Check for updates

আল্‌বেরুণীর ভারত-তত্ত্ব

আবু মহামেদ হবিবুল্লাহ

॥ অব্দাদির সংক্ষিপ্ত বিবরণ ॥

সময়ের কোনও বিশেষ কালকে অব্দের সাহায্যে চিহ্নিত করা যায়। যদিও বিরাট বিরাট সংখ্যা গণনা করতে হিন্দুরা ক্লান্তি বোধ করে না, বরঞ্চ তাতে আনন্দই পায়, তবুও ব্যবহারিক ক্ষেত্রে ওরা সংখ্যাকে সংক্ষিপ্ত করে নিতে বাধ্য হয়।

কাল গণনায় যে-সব ঘটনাকে ওরা চিহ্ন স্বরূপ ব্যবহার করে থাকে তা এই :

১. ব্রহ্মার অস্তিত্বের প্রারম্ভ।

২. ব্রহ্মার বর্তমান অহোরাত্রের অর্থাৎ কল্পের আরম্ভ।

৩. সপ্তম মন্বন্তরের আরম্ভকাল, যার মধ্যে আমরা আছি।

৪. ২৮ তম চতুর্যুগের প্রারম্ভকাল, যার মধ্যে আমরা আছি।

৫. বর্তমানে চতুর্যুগের শেষ যুগ।

এই যুগ 'কলি'র নামে খ্যাত, যদিও প্রকৃতপক্ষে তার সময় এই যুগের শেষভাগে পড়ে। তা সত্ত্বেও 'কলিকাল' বলতে হিন্দুরা 'কলিযুগের' প্রারম্ভই বোঝে।

৬. পাণ্ডবকাল, অর্থাৎ ভারত যুদ্ধের সময়। প্রাচীনতার দিক দিয়ে এসব ঘটনা অত্যধিক পুরাতন। তার থেকে অব্দ গণনা করলে সে অব্দের বৎসর সংখ্যা শত, সহস্র, লক্ষ পেরিয়ে যাবে। অন্যদের ত' কথাই নাই, জ্যোতিষীদের পক্ষেও এরকম অব্দের ব্যবহার দুষ্কর।

এই সব অব্দের পরিচয় দেবার জন্য, হিন্দুদের যে-বৎসরের সর্বাধিক ভাগ Yazdgird অব্দের ৪০০ সালের মধ্যে পড়ে, তুলনার জন্য সেই বৎসরকে আমি প্রাথমিক মান-বৎসর হিসাবে ব্যবহার করব। এই বৎসরাঙ্কেক শতকের সঙ্গে কোনও একক ও দশক সংখ্যা না থাকাতে অন্য বৎসরের তুলনায় এই কালটি আমাদের আলোচনার পক্ষে বিশেষ সুবিধাজনক। তা ছাড়া এই সনটি অন্য কারণেও স্মরণীয়; তারই বৎসর অনধিক কাল পূর্বে যুগ-মানব, জগৎসিংহ সুলতান মাহমুদের মত নৃপতি ও ধর্মের দৃঢ়তম স্তম্ভের লোকান্তর ঘটে। Yazdgird অব্দের নওরোজ হিন্দুদের বৎসরারম্ভের মাত্র ১২ দিন পরে হয়, এবং উপরোক্ত দুর্ঘটনা ফার্সি মাসের হিসাব অনুযায়ী, তারই পূর্ণ দশমাস পূর্বে ঘটেছিল।

আমাদের স্থিরীকৃত এই মান-বৎসর জানা থাকলে উপরোক্ত তারিখ থেকে আমরা বৎসর গণনা করতে থাকব, কেন না হিন্দুদের বৎসর ঐ তারিখে আরম্ভ হয়, এবং ঐ তারিখে প্রায় শেষ হয়, কেবল Yazdgird অব্দের প্রাগুক্ত ৪০০ সনের নওরোজ সেই তারিখের ১২ দিন পরে পড়ে।

'বিষ্ণুধর্মে' লিখিত আছে: "বজ্র মার্কণ্ডেয়কে জিজ্ঞাসা করলেন, "ব্রহ্মার আয়ুষ্কালের কতটা অতীত হয়েছে?" মার্কণ্ডেয় উত্তর দিলেন, "তুমি যে-অশ্বমেধ যজ্ঞ করেছ, সেই সময় পর্যন্ত তাঁর পরমায়ুর ১০ দিব্য বৎসর, ২৭ চতুর্যুগ, ৩ যুগ, ৭ সন্ধ্যা, ৬ মন্বন্তর, ৮ বৎসর, ৫ মাস ও ৪ দিবস অতীত হয়েছে।" তিনি আরও বললেন, "এই উক্তি যে বিস্তারিতভাবে বুঝবে এবং যথার্থভাবে হৃদয়ঙ্গম করবে, সে হবে মহাজ্ঞানী; এবং মহাজ্ঞানী সেই, যে একক প্রভুর বন্দনা করে, ও তাঁরই সান্নিধ্য লাভের সাধনা করে, যাঁকে পরমাস্পদ বলা হয়।"

কাল নিরূপণের পদ্ধতির যে-ব্যাখ্যা আমরা পূর্বে দিয়েছি, পাঠক তা স্মরণ রেখেছে ধরে নিয়ে আমি মার্কণ্ডেয়র এই উক্তির বিশ্লেষণ এইভাবে করছি:

আমাদের স্থিরীকৃত মান-বৎসর পর্যন্ত ব্রহ্মার আয়ুষ্কালের ২৬২১৫,৭৩, ২৯৪৮,১৩২ বৎসর গত হয়েছে। ব্রহ্মার অহোরাত্র, অর্থাৎ কল্পদিবসের ১৯৭২, ৯৮৪,১৩২, এবং সপ্তম মন্বন্তরের ১২০,৫৩২,১৩২ (বৎসর) অতীত হয়েছে। শেষোক্ত তারিখটি বলিরাজার বন্দী হওয়ার তারিখ, কারণ তা সপ্তম মন্বন্তরের প্রথম চতুর্যুগে ঘটেছিল।

যে-সব সন তারিখ আমরা উল্লেখ করেছি এবং ভবিষ্যতে করব, তা সবই সম্পূর্ণ বৎসর বলে ধরতে হবে, কেন না তারিখ নির্ণয়ে হিন্দুরা বৎসরের ভগ্নাংশকে ধর্তব্যের মধ্যে আনে না।

'বিষ্ণুধর্মে' উক্ত হয়েছে ঃ বজ্রের প্রশ্নের উত্তরে মার্কণ্ডেয় বললেন, "আমার জীবনের ৬ কল্প অতীত হয়েছে এবং সপ্তম কল্পের ৬ মন্বন্তর ও সপ্তম মন্বন্তরের ২৩ ত্রেতাযুগ অতীত হয়েছে। ২৪ ত্রেতাযুগে রাম রাবণকে বধ করেন, এবং তাঁর ভ্রাতা লক্ষ্মণ রাবণের ভ্রাতা কুম্ভকর্ণকে বধ করে রাক্ষসগণকে পরাস্ত করেন ; সে সময়ে ঋষি বাল্মীকি রাম ও রামায়ণের কাহিনী রচনা করে গ্রন্থাকারে তাঁকে অমরত্ব দান করেন। 'কাম্যক বনে' পাণ্ডব-পুত্র যুধিষ্ঠিরকে আমিই সে কাহিনী শুনিয়েছিলাম।"

বিষ্ণুধর্মকার এখানে ত্রেতাযুগ দিয়ে কালগণনা করেছেন, কারণ তাঁর বর্ণিত ঘটনাগুলি কোনও এক ত্রেতাযুগে সংঘটিত হয়েছিল। তাছাড়া অবিমিশ্র একক দিয়ে গণনা করাতে বেশী সুবিধা, অন্য কোনও মিশ্র একক ব্যবহার করলে তার চতুর্থাংশগুলির উল্লেখ না করলে পরিমিত অঙ্কটি স্পষ্ট হয় না। অধিকন্তু, ত্রেতাযুগের প্রথম ভাগ অপেক্ষা তার শেষ ভাগ উপরোক্ত ঘটনাগুলির জন্য বেশী উপযোগী, কেননা তা দুষ্কৃতি যুগের বেশী নিকটবর্তী। হিন্দুরা অবশ্য রাম ও রামায়ণের তারিখ জানে, আমি কিন্তু তা নির্ণয় করতে পারিনি।

২৩ চতুর্যুগে ৯৯, ৩৬০,০০০ বৎসর হয়, এবং পরবর্তী চতুর্যুগের আরম্ভ থেকে তার ত্রেতাযুগের শেষ পর্যন্ত বৎসর-সংখ্যা তার সঙ্গে যোগ করলে মোট ১০২, ৩৮৪,০০০ বৎসর হয়।

আমাদের মান-বৎসর সপ্তম মন্বন্তরের যত বৎসর গত হয়েছে, তার থেকে যদি উপরোক্ত বৎসর-সংখ্যা (১০২,৩৮৪,০০০) বিয়োগ করি, তাহলে ১৮, ১৪৮,১৩২ বৎসর থাকে, অর্থাৎ রামের আনুমানিক তারিখ আমাদের মান-বৎসর থেকে ১৮,১৪৮,১৩২ বৎসর পূর্বে হবে। কোনও নির্ভরযোগ্য শ্রুতি সমর্থন না করা পর্যন্ত এই তারিখটি আনুমানিক বলেই মানতে হবে। এই সনটি ২৮ তম চতুর্যুগের ৩,৮৯২,১৩২ তম বৎসর।

এই সমস্ত গণনা ব্রহ্মগুপ্তের অবলম্বিত পরিমাপ অনুযায়ী করা হয়েছে। পলিস ও ব্রহ্মগুপ্ত উভয়েই একমত যে বর্তমান কল্পের পূর্ব পর্যন্ত ব্রহ্মার আয়ুর ৬০৬৮ কল্প গত হয়েছে। তবে এই সংখ্যাকে চতুর্যুগে পরিণত করা নিয়ে এদের মতভেদ আছে। পলিসের মতে, ৬০৬৮ কল্পে ৬১১৬, ৫৪৪ চতুর্যুগ হয় আর ব্রহ্মগুপ্তের মতে ৪৮৫৪৪ কম অর্থাৎ (৬১১৬ ৫৪৪—৮৫৪৪) ৬০৬৮০০০ চতুর্যুগ হয়।

পলিসের মতানুসরণ করে আমরা যদি এক মন্বন্তরে, 'সন্ধ্যা' ব্যতিরেকে ৭২ চতুর্যুগ, আর এক কল্পে ১০০৮ চতুর্যুগ এবং প্রত্যেক যুগকে চতুর্যুগের এক চতুর্থাংশ ধরি, তাহলে আমাদের উপরোক্ত মান-বৎসর পর্যন্ত ব্রহ্মার আয়ুর ২৬,৪২৫,৪৫৬,২০৪,১৩২ বৎসর, কল্পের ১,৯৮৬,১২৪,১৩২ মন্বন্তরের ১১৯,৮৮৪,১৩২, আর চতুর্যুগের ৩২৪,৪৪১,৩২ বৎসর গত হয়েছে বলে মনে করতে হবে।

কলিযুগের আরম্ভ থেকে কত সম্পূর্ণ বৎসর গত হয়েছে সে সম্বন্ধে মতভেদ নাই। পলিস ও ব্রহ্মগুপ্ত উভয়ের মতে, আমাদের মান-বৎসর (৪০০ Yazdgird অব্দ) পর্যন্ত কলিযুগের ৪১৩২ বৎসর অতীত হয়েছে: অর্থাৎ এই সময়ের পরিমাপ হচ্ছে কলিকাল। এবং ভারত যুদ্ধ, অর্থাৎ পাণ্ডবকাল থেকে উক্ত সনের ব্যবধান হচ্ছে ৩৪৭৯ বৎসরের।

হিন্দুদের আর একটি অব্দ আছে: তার নাম 'কাল যবন' এই অব্দ সম্বন্ধে তেমন নিশ্চিত সংবাদ আমি পাইনি, তবে শুনেছি ওদের বিশ্বাস মতে এ অব্দের আরম্ভ দ্বাপরের শেষ ভাগে পড়ে। এই 'যবন' ওদের দেশ অধিকার ও ধর্মের প্রভূত ক্ষতি করেছিল।

এই সকল অব্দে সংখ্যার আধিক্য বড় বেশী, তাদের আরম্ভ কালও সুদূর অতীতে নিহিত। সে-জন্য হিন্দুরা এসব অব্দের ব্যবহার আর করেনা, এবং তার পরিবর্তে শ্রীহর্ষ, বিক্রমাদিত্য, শক, 'বলভ' ও গুপ্ত অব্দ অবলম্বন করেছে। শ্রীহর্ষ সম্বন্ধে ওদের বিশ্বাস যে তিনি সপ্ততল পর্যন্ত মৃত্তিকা পরীক্ষা করে তার গর্ভে নিহিত ধনরত্নের সন্ধান করতেন এবং তা আবিষ্কার করতেন। সেই ধন লাভ করার ফলে তাঁকে প্রজাদের উপর (কর) পীড়ন করতে হোত না। শ্রীহর্ষের অব্দ মথুরা ও কনৌজ অঞ্চলে ব্যবহার হয়। ঐ অঞ্চলের কতক লোক

আমাকে বলেছে যে শ্রীহর্ষের ও বিক্রমাদিত্যের মধ্যে ৪০০ বৎসরের ব্যবধান। তবে একটি কাশ্মীরী পঞ্জিকাতে দেখেছি যে শ্রীহর্ষ বিক্রমাদিত্যের ৬৬৪ বৎসর পরবর্তী কালের লোক। এই দুই প্রকার সংবাদে আমার মনে গভীর সন্দেহ জন্মেছে; সে সন্দেহ দূর করার মত কোনও নিশ্চিত তথ্য এখনো পাইনি।

যারা বিক্রমাদিত্যের অব্দ ব্যবহার করে, তারা ভারতবর্ষের দক্ষিণ ও পশ্চিমাঞ্চলের অধিবাসী। তারা ৩৪২ কে ৩ দিয়ে গুণ করে, গুণফল স্বরূপ যে ১০২৬ সংখ্যা পায়, তাতে বর্তমান 'ষষ্ঠাব্দের' অর্থাৎ ৬০ সম্বৎসর চক্রের যত বৎসর গত হয়েছে; তা যোগ করে, যে সংখ্যা পায় তাই তারা বিক্রমাব্দের সন বলে ধরে নেয়। মহাদেবকৃত 'শ্রুবধ' নামক পুস্তকে বিক্রমাদিত্যের নাম আমি চন্দ্রবীড় ('চন্দ্রপীড় ?") লেখা দেখেছি।

প্রথমতঃ গণনার এই পদ্ধতি খুবই কৃত্রিম। ওরা যদি অকারণে ৩৪২ দিয়ে গণনা আরম্ভ করতে পারে, তাহলে অকারণে ১০২৬ দিয়ে গণনা করলেও একই ফল পাওয়া যাবে। দ্বিতীয়তঃ যদি তারিখের মধ্যে একটিমাত্র 'ষষ্ঠাব্দ' থাকে সেক্ষেত্রে এ পদ্ধতি ঠিক বলে না হয় ধরা যেতে পারে, কিন্তু যদি একাদিক ষষ্ঠাব্দ থাকে তাহলে কি হবে?

শকাব্দ অর্থাৎ শককাল বিক্রমাদিত্যের কালের ১৩৫ বৎসর পরবর্তী। আসমুদ্র সিন্ধু ভারতবর্ষের মধ্যস্থিত আর্যাবর্তে বাস স্থাপন করে এই শক সে-দেশের উপর প্রভুত্ব করেছিল এবং ভারতীয়দিগকে শক ভিন্ন অন্য কোনও জাতির সাথে নিজ সম্বন্ধের পরিচয় দেওয়া নিষিদ্ধ করে দিয়েছিল। কেউ কেউ বলে, এই শক আলমানসুরার এক শূদ্র ছিল; আবার কারও কারও মতে, সে ভারতীয় নয়, পশ্চিমের কোনও দেশ থেকে ভারতবর্ষে এসেছিল। ভারতীয়রা তার হাতে খুবই নির্যাতিত হয়েছিল। অবশেষে পূর্বদেশ থেকে তাদের কাছে সাহায্য এসে পৌঁছল যখন বিক্রমাদিত্য তার বিরুদ্ধে অভিযান চালিয়ে মুলতান ও Loni দুর্গের মধ্যবর্তী 'করুর' অঞ্চলে তাকে পরাস্ত ও নিহত করলেন। অত্যাচারী নিহত হওয়ার তারিখ সেই থেকে লোকে আনন্দের সঙ্গে মনে রাখল এবং বিশেষ করে জ্যোতিষীরা এক নূতন অব্দের প্রারম্ভ হিসাবে সেই তারিখটি ব্যবহার করতে লাগল। এবং রাজা বিক্রমাদিত্যের সম্মানার্থে তাঁর নামের সঙ্গে 'শ্রী' ব্যবহার করতে লাগ্‌ল।

বিক্রমাদিত্যের উপরোল্লিখিত অব্দ থেকে শক বধের সময়ের মধ্যে দীর্ঘ ব্যবধান আছে বলে আমার মনে হয়, যে-বিক্রমাদিত্যের নামে অব্দ প্রচলিত আছে, সে শক-হন্তা বিক্রমাদিত্য নয়, সেই নামের অন্য আর এক ব্যক্তি।

'বলভ' অব্দ 'বলভি' নগরের রাজার নামাঙ্কিত। এ নগর অন্‌হিলওয়ারার ৩০ যোজন দক্ষিণে অবস্থিত। এই অব্দের আরম্ভকাল শকাব্দ থেকে ২৪১ বৎসর পরে। এর ব্যবহারকারীরা প্রথমে শক-কালের চলমান বৎসর সংখ্যা লিখে তার থেকে ৬ এর ঘনফল (cube) ও ৫ এর বর্গফল (square) (২১৬+২৫ =২৪১) বিয়োগ করে যা অবশিষ্ট থাকে তা বলভ অব্দের সাল। বলভের কাহিনী যথাস্থানে লেখা হয়েছে।

'গুপ্তকাল' সম্বন্ধে বলা হয় যে, গুপ্তরা দুষ্ট ও দুর্দান্ত জাতি ছিল। সে জন্য তাদের উচ্ছেদের তারিখ থেকে এক নতুন অব্দের সূচনা হয়। মনে হয় 'বলভ'-ই এসব অব্দের মধ্যে সর্বাপেক্ষা আধুনিক, কারণ তার আরম্ভ শকাব্দের ২৪১ বৎসর পর হয়।

জ্যোতিষীদের অব্দ শককালের ৫৮৭ বৎসর পরে আরম্ভ হয়। ব্রহ্মগুপ্তের 'খণ্ডখাদ্যক' নামক পঞ্জিকা এই অব্দ অনুসারে রচিত ; আমাদের সমাজে এই পুস্তকটি অল্-অর্‌কন্দ্‌ নামে পরিচিত। অতএব, আমরা যে মান-বৎসর (Yazdgird অব্দের ৪০০ সাল) অবলম্বন করেছি, সে বৎসরটি ভারতীয় অব্দগুলির নিম্নলিখিত সালে পড়ে ঃ

শ্রীহর্ষের অব্দের	১৪৮৮ সাল
বিক্রমাব্দের	১০৮৮ ,,
শককালের	৯৫৩ ,,
বলভ ও গুপ্তকালের	৭১২ ,,
খণ্ডখাদ্যক পঞ্জিকার অব্দানুযায়ী	৩৬৬ ,,
বরাহ মিহিরের 'পঞ্চসিদ্ধান্তকে' ব্যবহৃত অব্দের	৫২৬ ,,
করণসারের অব্দের	১৩২ ,,
করণতিলকের অব্দের	৬৫ ,,

পঞ্জিকা সংক্রান্ত যে-সব কথা এখানে বলা হল, মনে হয় পঞ্জিকার রচয়িতারা সে অব্দগুলিকে গণনার আঙ্কিক ভিত্তি হিসাবে ব্যবহারের উপযোগী মনে করেছিল। এমনও হোতে পারে যে তাদের জীবৎকালের সমসাময়িক অব্দকেই তারা গণনার কেন্দ্র হিসাবে ব্যবহার করেছে। আবার এ-ও অসম্ভব নয় যে তাদের জীবৎকালের পূর্ববর্তী কোনও অব্দের তারিখ তারা ব্যবহার করেছে।

ভারতের জনসাধারণ শত বৎসর ধরে কাল গণনা করে; শত বৎসর কালকে তারা 'সম্‌বৎসর' বলে। একশত বৎসর শেষ হলে, সে শতাব্দী ছেড়ে দিয়ে পরবর্তী শতাব্দী ধরে তারা তারিখ নির্ধারণ করে। এই চলমান শতাব্দীকে ওরা বলে 'লোককাল', অর্থাৎ জনসাধারণের অব্দ। 'লোককাল' সম্বন্ধে এত বিভিন্ন প্রকারের সংবাদ লোকে আমাকে দিয়েছে যে তার সত্যাসত্য নির্ণয় আমার ক্ষমতা নয়। বৎসরারম্ভ নিয়েও ওদের মধ্যে এই প্রকার মতানৈক্য আছে। এ বিষয়ে যা নিজে শুনেছি তা এখানে বলছি; হয়তো কোনদিন এ আপাত-বিশৃঙ্খলার মধ্যে একটা নীতির সন্ধান পাওয়া যেতে পারে।

যারা শককাল ব্যবহার করে, অর্থাৎ জ্যোতিষীরা, তারা চৈত্রমাস থেকে বৎসর আরম্ভ করে, কিন্তু কাশ্মীরের সীমান্তস্থিত কনির (؟) বাসীরা আরম্ভ করে ভাদ্রপদায়। এই শেষোক্ত লোকেরা আমাদের পূর্বোল্লিখিত (Yazdgird অব্দের ৪০০) সালকে ওদের অব্দের ৪৮ সাল বলে ধরে।

যারা বরদারী ও মারিকলার অন্তর্বর্তী ভূভাগে বাস করে, তারা কার্তিক মাস দিয়ে বর্ষ আরম্ভ করে। এবং উপরোক্ত সন তাদের অব্দের ১১০ সাল হয়। কাশ্মীরী পঞ্জিকাকারের মতে, ঐ সনটি নূতন শতাব্দীর ষষ্ঠ সাল। কাশ্মীরীরা এই রীতিই পালন করে।

মারিকলার পিছনে তাকেশ্বর (تاكشر) লোহাবর (لوهاور-লাহোর) -এর সীমানা পর্যন্ত নীরহর অধিবাসীরা 'মার্গশীর্ষ' মাস থেকে বর্ষ আরম্ভ করে। এবং পূর্বোক্ত সালকে তাদের অব্দের ১০৮ তম সাল বলে ধরে। 'লম্বক' অর্থাৎ লমঘান-এর লোকেরাও এই রীতি অনুসরণ করে। মুলতানের লোকের মুখে শুনেছি যে সিন্ধু ও কনৌজবাসীদেরও এই রীতি ছিল, তারাও 'মার্গশীর্ষ'

দিয়ে বর্ষ আরম্ভ করতো। তবে, মাত্র কয়েক বৎসর হোল মুলতানবাসীরা এ রীতি বর্জন করে কাশ্মীরী রীতি অবলম্বন করেছে এবং এখন চৈত্রমাস থেকেই তারা বর্ষ গণনা করে থাকে।

এই অধ্যায়ে বর্ণিত তথ্যের অসম্পূর্ণতার জন্য আমি পূর্বেই মার্জনা চেয়েছি। ওদের অব্দ সমূহের বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা দেওয়া দুরূহ, কারণ তাতে এক শতাব্দীর চেয়ে অনেক দীর্ঘতর কাল সূচিত হয়, যার নির্ধারণে কোনও বিজ্ঞানসম্মত নিয়ম নাই। আমি নিজে দেখেছি, ৪১৬ হিজরী ও ৯৪৭ শককালের ঘটনা, সোমনাথ ধ্বংসের তারিখ ওরা কিভাবে নিরূপণ করে। প্রথমে ২৪১ লিখে, তার নীচে ৬০৬ ও তার নীচে ৯৯ লিখে তিনটি সংখ্যাকে একত্র যোগ করে ঘটনাটির শককাল নির্ণয় করে। আমার মনে হয় ২৪২ হচ্ছে সম্বৎসর গণনার রীতি আরম্ভ হওয়ার পূর্বে অতীত বৎসর সংখ্যা। গুপ্তকাল থেকেই ওরা শতাব্দী গণনার রীতি আরম্ভ করেছে। আর ৬০৬ হচ্ছে প্রত্যেক সম্বৎসরকে ১০১ বৎসর ধরে ৬ সম্বৎসরের মোট বৎসর সংখ্যা, এবং ৯৯ হচ্ছে চলমান সম্বৎসরের অতীত বর্ষ সংখ্যা।

কোনও বিশেষ ঘটনার তারিখ নির্ণয় করার এইটিই যে অনুমোদিত নিয়ম তা ঘটনাক্রমে প্রাপ্ত মুলতানের দুর্লভকৃত পঞ্জিকার একটি পাতা থেকে আমি প্রমাণ পেয়েছি। তাতে লেখক বলছেন; "প্রথমে ৮৪৮ লিখে তার সাথে লৌকিক কাল যোগ দাও। যোগফল হবে শককাল।"

আমাদের অবলম্বিত Yazdgird অব্দের ৪০০ সনের সমসাময়িক শককালের সন অর্থাৎ ৯৫৩ থেকে যদি ৮৪৮ বিয়োগ করি, অবশিষ্ট ১০৫ হবে 'লৌকিক কাল,' এবং সেকালের ৯৮ তম বৎসরে সোমনাথ ধ্বংসের ঘটনা ঘটেছিল।

দুর্লভ আরও বলছেন যে বর্ষ আরম্ভ হয় মার্গশীর্ষ থেকে, কিন্তু মুলতানের জ্যোতিষীরা চৈত্রমাস থেকে বর্ষ আরম্ভ করে।

হিন্দুদের এক রাজবংশ ছিল যারা কাবুলে বাস করত। তারা জাতিতে তুর্কী। তারা আসলে তিব্বতী ছিল। এদের প্রথম রাজার নাম 'বরহতিগিন'। প্রথমে সে কাবুলে এসে এক পর্বত গুহায় প্রবেশ করে। গুহাটি এত সঙ্কীর্ণ যে বুকে হাঁটা ছাড়া অন্য উপায়ে তাতে প্রবেশ করা যায় না। গুহার মধ্যে

জল ছিল ; সেখানে কয়েক দিবসের মত প্রয়োজনীয় খাদ্য সে জমা রাখল। গুহাটি এখনো কাবুলে 'বর' (؟ بر = Var ؟) নামে পরিচিত। গুহার অলৌকিক গুণে যে বিশ্বাস করে, সে তাতে প্রবেশ করে বহুকষ্টে সেই জল নিয়ে আসে। গুহার সম্মুখে একদল কৃষক কর্মরত ছিল। কারও সঙ্গে গোপন ষড়যন্ত্র ব্যতীত এ ধরণের কৌশল কখনই সফল ও প্রচার লাভ করে না। এ ক্ষেত্রে এই গোপন সহকারীরা একদল লোককে পালাক্রমে সেখানে দিবারাত্র কর্ম করার জন্য নিযুক্ত করল যাতে স্থানটি কখনই জনশূন্য না হয়। গুহা প্রবেশের পর কিছুদিন গত হলে বরহ্‌তিগিন্ সকলের সমক্ষে গুহা থেকে বহির্গত হতে আরম্ভ করল। মাতৃগর্ভ হতে যেমন সন্তান ভূমিষ্ঠ হচ্ছে লোকে তাকে তেমনই কৌতূহলের সঙ্গে দেখতে লাগল। লোকটি বুকখোলা তুর্কী কোট পরিহিত ছিল, মাথায় দীর্ঘ টুপী, পায়ে হাঁটু পর্যন্ত চামড়ার জুতা ও হাতে অস্ত্র। তার আবির্ভাবকে অলৌকিক বিশ্বাস করে লোকে তাকে সম্মান করতে লাগল, যেন রাজত্ব করার জন্যই তার সৃষ্টি হয়েছে। এই অঞ্চলসমূহকে সে স্বীয় কর্তৃত্বে এনে এবং কাবুলের 'সাহিয়া' নামে তাদের উপর রাজত্ব করতে থাকল। দীর্ঘকাল ধরে পুরুষানুক্রমে তার বংশধরেরা সে দেশে রাজত্ব করেছিল ; শোনা যায়, তার বংশীয় রাজাদের সংখ্যা প্রায় ৬০।

হিন্দুরা শৃঙ্খলা রক্ষার প্রতি বড়ই উদাসীন। রাজাদের ঐতিহাসিক বর্ণনায় কালানুক্রমিক পারম্পর্যে তারা মোটেই যত্ন নেয় না। এবং সংবাদের পীড়াপীড়ি করলে উত্তর দেবার মত কিছু না পেয়ে ওরা গাল-গল্পের আশ্রয় নেয়। তা' না হলে ওদের কতক লোকের নিকট থেকে আমি যা শুনেছি তা এখানে লিপিবদ্ধ করতাম। তবে আমি শুনেছি যে রেশমে লিখিত এই সাহিয়া রাজাদের একটি বংশ তালিকা নগরকোট দুর্গে রক্ষিত আছে। আমার সেটি দেখার অত্যন্ত আগ্রহ ছিল, কিন্তু নানা কারণে তা সম্ভব হয়নি।

এই বংশের একজনের নাম 'কনিক', যাকে 'পুরধাওর' বিহারের প্রতিষ্ঠাতা মনে করা হয় ; তারই নামে এই বিহারকে বলা হয় কনিকচৈত্য। কথিত আছে কনৌজের রাজা তাকে অন্যান্য উপঢৌকনের সঙ্গে মহামূল্য অনন্যসাধারণ এক খণ্ড বস্ত্র পাঠিয়েছিল। কনিক সে বস্ত্র দিয়ে নিজের জন্য একটি জামা তৈরী করাতে

চাইলেন, কিন্তু দর্জি তা করতে সাহস পেলনা। সে বলল: "বস্ত্রখণ্ডে মানুষের পায়ের ছবি আছে; যত চেষ্টাই করিনা কেন, ছবিটি দুই কাঁধের মাঝখানে পড়ে।" বলি রাজার গল্পে আমরা যা বলেছি এখানেও তারই ইঙ্গিত ছিল। কনিক তখন বুঝতে পারল, কনৌজ-রাজ এই বস্ত্র পাঠিয়ে তাকে অপমান ও উপহাস করতে চেয়েছে। তৎক্ষণাৎ সে সৈন্য নিয়ে কনৌজ অভিমুখে ধাবিত হোল। এ সংবাদ পেয়ে কনৌজ-রাজ উদ্বিগ্ন হোল, কারণ কনিককে প্রতিরোধ করার ক্ষমতা তার ছিল না। মন্ত্রীর সঙ্গে পরামর্শ করাতে মন্ত্রী বলল: "তুমি একজন শান্ত লোককে উত্তেজিত করে অনুচিত কর্ম করেছ। এখন আমার নাসিকা ও ওষ্ঠ ছেদন করে আমাকে বিকালাঙ্গ করে দাও, দেখি প্রতারণার দ্বারা কোনও উপায় করা যায় কিনা, কারণ সম্মুখ-প্রতিরোধের কোনও সম্ভাবনা দেখি না।" রাজা তাকে তাই করল। রাজা মন্ত্রীকে সেখানে সেই অবস্থায় ফেলে রেখে রাজ্যের সীমান্তে চলে গেল। অভিযাত্রী সৈন্যদল মন্ত্রীকে সেই অবস্থায় পেয়ে তাকে চিনতে পেরে কনিকের কাছে নিয়ে এল। তার দুরবস্থার কারণ জিজ্ঞাসা করাতে মন্ত্রী বলল, "আমি কনৌজ-রাজাকে তোমার বিরোধিতা করতে নিষেধ করতাম, এবং তোমার বশ্যতা স্বীকার করতে তাকে পরামর্শ দিতাম। তাতে সে আমাকে সন্দেহ করে আমার এই অবস্থা করেছে। তার পরে রাজা স্বইচ্ছায় এমন এক দূরদেশে যাত্রা করেছে, যেখানে পৌঁছিবার পথ সরল, কিন্তু অতি দীর্ঘ। তবে মরুভূমির উপর দিয়ে যেতে পারলে আরও সংক্ষিপ্ত হয়, অবশ্য যদি এতদিনের মত প্রয়োজনীয় পানীয় জল বহন কেউ করে।" "তা সহজেই করা যায়"—এ কথা বলে কনিক জলবহনের ব্যবস্থা করল এবং মন্ত্রীকে পথ প্রদর্শকরূপে সঙ্গে নিল। আগে আগে গিয়ে মন্ত্রী কনিককে এক সীমাহীন মরুভূমিতে নিয়ে এলো। যতদিনে গন্তব্যস্থানে পৌঁছবার কথা ছিল, সে দিনগুলি গত হবার পরও যখন পথের শেষ দেখা গেল না, তখন কনিক মন্ত্রীকে কর্তব্য জিজ্ঞাসা করল। মন্ত্রী বলল: "আমি আমার প্রভুকে রক্ষা করতে ও তাঁর শত্রুকে বিনাশ করার চেষ্টা করে কোনও অপরাধ করিনি। যে-পথ দিয়ে এসেছ মরুভূমি থেকে বেরুবার সেটাই একমাত্র নিকটতম পথ। এখন তুমি আমাকে নিয়ে যা ইচ্ছা তা করতে পার, এখান থেকে কিন্তু উদ্ধার পাওয়া অসম্ভব।" একথা শুনে কনিক অশ্বারোহণ করে এক নীচু

ভূমির চতুর্দিকে ঘুরতে লাগল। সে জমির মধ্যস্থলে তার বর্শা বিদ্ধ করতেই তৎক্ষণাৎ সেখান থেকে এত জল নির্গত হোতে লাগলো যে সৈন্যদের পান ও প্রত্যাবর্তনের পথে বহন করার জন্যও পর্যাপ্ত হলো। তা দেখে মন্ত্রী বলল, "পরাক্রান্ত দেবতাদের সঙ্গে ছলনা করা আমার উদ্দেশ্য ছিল না, দুর্বল মানুষের বিরুদ্ধেই আমার কূটকৌশল প্রয়োগ করেছিলাম। ব্যাপার যখন এইরূপ দাঁড়াল, তখন আমার প্রভু ও অন্নদাতার জন্য আমার আবেদন মঞ্জুর করে তাকে ক্ষমা কর।" কনিক বললে, "আমরা এখান থেকে ফিরে যাব। তোমার প্রার্থনা আমি মঞ্জুর করলাম; তোমার প্রভু তাঁর উচিত প্রাপ্যই পেয়েছেন।" কনিক স্বদেশে ফিরে গেল, এবং মন্ত্রী তার কনৌজ-রাজের কাছে গিয়ে পৌঁছল। গিয়ে দেখল, যেদিন কনিক মাটিতে তার বর্শা গেড়েছিল, সেই দিনই কনৌজ-রাজের দেহ থেকে তার হাত ও পা খসে পড়েছে।

এই বংশের শেষ রাজা ছিল 'লঘতুর্মান'। তার এক ব্রাহ্মণ মন্ত্রীর নাম ছিল 'কল্লুর'। এই মন্ত্রী ভাগ্যবান ছিল, কেননা ঘটনাক্রমে অনেক গুপ্ত রত্ন সে পেয়েছিল, যার বলে সে অত্যন্ত প্রভাবশালী ও ক্ষমতাবান হয়ে উঠেছিল। এই কারণে এতদিন রাজদণ্ড ধারণ করার পর রাজ-বংশের হাত থেকে ক্ষমতা খসে পড়তে থাকল। লঘতুর্মান-এর আচরণ ও স্বভাব মন্দ হয়ে গেল এবং রাজার বিরুদ্ধে মন্ত্রীর কাছে বহু অভিযোগ আসতে লাগ্‌ল। তখন মন্ত্রী তাকে বন্দী করে তার চরিত্র শুদ্ধির জন্য তাকে কারারুদ্ধ করে রাখল। কিন্তু অপ্রতিহত ক্ষমতা মন্ত্রীর ভাল লাগল; ক্ষমতা বিস্তৃত করার মত ধনও তার ছিল। সুতরাং সে নিজেই রাজা হয়ে বস্‌ল। কল্লুরের পর এই ব্রাহ্মণ বংশে ক্রমান্বয়ে এরা রাজা হয়েছিল: সামন্দ (সামন্ত), কমলু, ভীম, জয়পাল আনন্দ পাল ও তিরোজন পাল (ত্রিলোচন পাল)। ৪১২ হিজরীতে ত্রিলোচন পাল নিহত হয়, এবং তার পাঁচ বৎসর পরে তার পুত্র ভীমপালও নিহত হয়, সেই থেকে এই হিন্দু সাহিয়া বংশ লুপ্ত হয়ে গেছে; সে বংশে বাতি দেবার মতও আর কেউ অবশিষ্ট নাই।

পরাক্রমশালী হয়েও এ বংশের রাজারা নিয়ত সদাচরণ ও হিতকর্মে রত থাকত, প্রতিশ্রুতি পালনে ও সত্য রক্ষায় অটল, উচ্চমনা ও দৃঢ়চেতা

ছিল। আমীর মাহমুদকে লিখিত আনন্দপালের এই পত্রটিকে আমি অতীব প্রশংসনীয় মনে করি, যখন এটি লেখা হয় তখন দুই নৃপতির পারস্পরিক বৈরীভাব চরমে পৌঁছেছিল। "আমি শুনেছি, তুর্কীরা তোমার বিরুদ্ধে অভিযান করেছে ও খোরাসান প্রদেশে উপদ্রব আরম্ভ করেছে। তুমি যদি বল, আমি পাঁচ সহস্র অশ্বারোহী, দশ সহস্র পদাতিক সৈন্য ও একশত হস্তী নিয়ে সাহায্য করতে আসতে পারি, অথবা তুমি যদি চাও, আমার পুত্রকে তার দ্বিগুণ সৈন্য দিয়ে তোমার কাছে প্রেরণ করতে পারি। তা করে তোমাকে চমৎকৃত বা প্রভাবিত করা আমার উদ্দেশ্য নয়। আমি তোমার দ্বারা বিজিত হয়েছি; তোমাকে আমি ব্যতীত অন্য কেউ পরাজিত করুক তা আমি চাই না।"

যখন থেকে তার পুত্র মুসলমানদের হাতে বন্দী হয়েছিল, তখন থেকে আনন্দপাল মুসলমানদের প্রতি অপরিসীম বিদ্বেষ পোষণ করত। এ বিষয়ে তার পুত্র তিরোজনপাল কিন্তু তার সম্পূর্ণ বিপরীত ছিল।

॥ ব্রাহ্মণ ও তাদের যাবজ্জীবন পালনীয় কর্তব্য ॥

বালকের বয়স সাত বৎসর অতিক্রম করার পর থেকে ব্রাহ্মণের জীবনকালকে চারভাগে ভাগ করা হয়। প্রথম ভাগ অষ্টম বৎসরে আরম্ভ হয়, যখন ব্রাহ্মণেরা তাকে উপদেশ ও কর্তব্য শিক্ষা দেবার জন্য তার কাছে আসে; দায়িত্বপালনে আজীবন নিষ্ঠাবান থাকতে উপদেশ দেয়। তারপর এক খণ্ড সুতা তার কটিদেশে বেঁধে দেয় ও 'যজ্ঞোপবীত' নামক সাতটি সুতাকে একত্র করে পাকান এক জোড়া শক্ত সুতার গুচ্ছ তার গলায় পরিয়ে দেয়, কাপড়ের একটি সুতার তৈরী আর একটি উপবীতও তাকে পরিয়ে দেয়। এই সুতার গুচ্ছগুলি বাম স্কন্ধ থেকে দক্ষিণ জানুর উপরে এসে পড়ে। ব্রাহ্মণ বালককে একটি যষ্টি ধারণ করতে দেওয়া হয়। ও দুর্বা নামক এক প্রকার ঘাসের তৈরী অঙ্গুরী তার দক্ষিণ হাতের দক্ষিণ আঙ্গুলে পরতে দেওয়া হয়। এই অঙ্গুরীকে পবিত্র বলা হয়। এ ভাবে অঙ্গুরী ধারণের উদ্দেশ্য হোল যে সে-হাত থেকে সে যা দান করবে তা শুভ ও কল্যাণযুক্ত হবে। তবে যজ্ঞোপবীত ধারণ সম্পর্কে যেমন কঠোরতা, অঙ্গুরীয় ধারণের বেলায় তেমন নয়; কোনও অবস্থাতেই দেহ থেকে উপবীত পৃথক্ করতে পারবে না, ভোজনকালে

উপবীত খুলে রাখলে, কিংবা উপবীতহীন অবস্থায় মলমূত্র ত্যাগ করলে পাপ হবে, উপবাস বা দান দ্বারা প্রায়শ্চিত্ত না করলে যার মোচন হবে না।

২৫ বৎসর বয়স পর্যন্ত ব্রাহ্মণের জীবনের এই প্রথম ভাগ (আশ্রম) থাকবে; বিষ্ণু পুরাণে ২৫ এর স্থলে আমি ৪৮ পেয়েছি। এই আশ্রমে তার অবশ্য কর্তব্য হবে ব্রহ্মচর্য, ভূমিশয়ন, দিবারাত্র গুরুসেবা। বেদ ও তার ভাষ্য অধ্যয়ন এবং ধর্ম ও স্মৃতিশাস্ত্র পাঠ। দিনে তিনবার সে স্নান করবে ও দিবারম্ভে ও দিনাবসানে হোম করে গুরুকে প্রণাম করবে; একদিন অন্তর উপবাস করবে মাংসমাত্র তার অভক্ষ্য; গুরুগৃহেই সে বাস করবে এবং দিনের মধ্যে মাত্র একবার এবং মধ্যাহ্নে কিংবা সায়াহ্নে দান গ্রহণ বা যাচ্ঞা বা মাত্র পাঁচটি গৃহে ভিক্ষা চাওয়ার জন্য বেরুতে পারে। ভিক্ষায় যা পাবে তা সবই গুরুর সম্মুখে স্থাপন করবে, ইচ্ছানুযায়ী তিনি তার থেকে নেওয়ার পর অবশিষ্ট ভাগ শিষ্যকে নিতে অনুমতি দেবেন। এইভাবে গুরুর উদ্বৃত্ত অন্নে সে জীবন ধারণ করবে। ব্রাহ্মণ তা ছাড়া, হোমাগ্নির জন্য পলাশ ও "দর্ব" বৃক্ষের কাঠ সংগ্রহ করে আনবে, কারণ অগ্নি হিন্দুদের অতি পূজনীয়, তাকে পুষ্পাঞ্জলি দিতে হয়। সব জাতিদের মধ্যেই এই রকম অভ্যাস আছে। ওরা সর্বদা বিশ্বাস করত যে হোমাগ্নি যদি অস্পর্শ করে তাহলে দেবতা সে অর্ঘ্য গ্রহণ করেন। বিগ্রহ, নক্ষত্র, গাভী, গাধা বা প্রতিকৃতি কোন কিছুর পূজাই তাদিগকে এ বিশ্বাস থেকে সরাতে পারেনি। সে জন্য Bashshar b.Burd একটি কবিতাংশে বলেছেন: "যেহেতু সে অগ্নি, সেহেতু সে পূজ্য।"

ব্রাহ্মণের জীবনের দ্বিতীয় ভাগ ২৫ থেকে ৫০ বৎসর বয়স পর্যন্ত; বিষ্ণুপুরাণ মতে ৭০ বৎসর পর্যন্ত। এই ভাগে গুরু তাকে দার পরিগ্রহ করার অনুমতি দেবেন; সে তখন বিবাহ করে গৃহসংসার পাতবে এবং বংশ রক্ষার সংকল্প করবে। কিন্তু মাসে মাত্র একবার ঋতুস্নানের পর স্ত্রী-সঙ্গম করবে। দ্বাদশ বৎসরোর্ধ্বা বন্ধ্যা বিবাহ ব্রাহ্মণের জন্য নিষিদ্ধ। ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়ের অধ্যাপনা করে পারিশ্রমিক হিসেবে নয়, দক্ষিণা ও উপঢৌকন রূপে যা পাবে, তাই দিয়ে ব্রাহ্মণ জীবিকা নির্বাহ করবে, কিংবা অন্যের যজ্ঞে পৌরোহিত্যের দক্ষিণা স্বরূপে অথবা রাজা ও শ্রেষ্ঠীদের দেওয়া ধনে, যার প্রার্থনায় দীন অনুনয় নাই, আর যাতে দাতার

অনিচ্ছা নাই, সেই ধনে ব্রাহ্মণ জীবিকা নির্বাহ করবে। এই সব লোকদের গৃহে শাস্ত্র ও পুণ্যকর্মের জন্য একজন ব্রাহ্মণ নিযুক্ত থাকে, তাকে 'পুরোহিত' বলা হয়। ভূমি বা বৃক্ষ থেকে সংগৃহীত দ্রব্য দিয়েও ব্রাহ্মণ জীবিকা অর্জন করতে পারে। বস্ত্র ও সুপারীর বাণিজ্য ব্রাহ্মণ নিজ ভাগ্য পরীক্ষার জন্য করতে পারে। তবে নিজে না করে বৈশ্য তার হয়ে ব্যবসা করাই উত্তম, কেন না ব্যবসা নীতিগতরূপে বারণ এই জন্য যে তাতে প্রতারণা ও মিথ্যাচারের সংস্পর্শ থাকে। জীবিকার অন্য কোন উপায় নাই এমত অবস্থাতেই ব্রাহ্মণ ব্যবসা করতে পারে। অন্যান্য বর্ণের মত, ব্রাহ্মণের রাজকে কোনও কর দিতে বা বেগার খাটতে হয় না। অশ্ব, গাভী ও অন্যান্য গৃহপালিত পশুর পরিচর্যায় ব্যস্ত থাকা ও সুদী কারবার করাও তার জন্য নিষিদ্ধ। নীল রঙ তার জন্য অপবিত্র; সে-রঙ তার শরীরে লাগলে স্নান করা বিধেয়। ব্রাহ্মণকে সর্বদা অগ্নির সমক্ষে খঞ্জনী বাদন ও শাস্ত্র সম্মত মন্ত্র পাঠে রত থাকতে হবে।

আর জীবনের তৃতীয় ভাগ ৫০ থেকে ৭৫ বৎসর পর্যন্ত। বিষ্ণু পুরাণমতে ৯০ বৎসর বয়স পর্যন্ত। জীবনের এই পর্যায়ে সে ব্রহ্মচারী হবে। স্ত্রী তার সাথে বনে যেতে সম্মত না হলে তাকে পুত্রের হাতে সমর্পণ করে সংসার ত্যাগ করবে এবং জনপদের বাইরে গিয়ে উপরে বর্ণিত প্রথমভাগের মত জীবন যাপন করবে, ছাদ বা চাল বিশিষ্ট ঘরে কখনও বাস করবে না, কেবল লজ্জা নিবারণের জন্য বল্কল ছাড়া আর কিছু পরিধান করবে না, অনাবৃত ভূমিতে শয়ন করবে, আর ফল, পাতা ও মূল ছাড়া আর কিছু ভোজন করবে না, কেশ বর্ধন করবে, আর কখনও তেল মাখবে না। আর, চতুর্থ পর্যায় মৃত্যুকাল পর্যন্ত। সে পর্যায়ে ব্রাহ্মণ রক্তবস্ত্র পরিধান করবে, হাতে যষ্টি ধারণ করবে। সর্বদা ধ্যান করবে এবং অন্তঃকরণকে মৈত্রী ও বিদ্বেষ থেকে সম্পূর্ণরূপে মুক্ত করবে। কাম, লোভ ও ক্রোধ নির্মূল করবে, একান্ত নিঃসঙ্গবাস করবে। পুণ্যার্জনের জন্য তীর্থক্ষেত্রে যাবার পথে কোন গ্রামে একদিন ও নগরে ৫ দিনের বেশী অবস্থান করবে না, কেউ কোনও খাদ্যদ্রব্য দান করলে পরদিনের জন্য তার অবশিষ্ট সঞ্চয় করে রাখবে না। পরিত্রাণ ও মোক্ষলাভের পথ সন্ধান ব্যতীত তার অন্য কোনও চিন্তা থাকবেনা, যে অবস্থা থেকে আর পৃথিবীতে প্রত্যাবর্তন হবে না।

ব্রাহ্মণের আজীবন সাধারণ কর্তব্য হচ্ছে পুণ্যকর্ম, দান ও দান গ্রহণ। কারণ ব্রাহ্মণকে যা দান করা হয় তা পিতৃদের কাছেই যায়। সর্বদা মন্ত্রপাঠ ও যজ্ঞানুষ্ঠান, অগ্নি স্থাপন, তার পূজা ও অর্ঘ্য দান ও যাতে নিবে না যায় তার যত্ন নেওয়া, যাতে মৃত্যুর পর সে-অগ্নি তাকে দগ্ধ করে। অগ্নির এইরূপ পরিচর্যা করাকে 'হোম' বলে। দৈনিক ত্রিসন্ধ্যায় সে স্নান করবে, 'উদয় সন্ধ্যায়', অর্থাৎ ঊষায় 'অস্ত সন্ধ্যায়' অর্থাৎ গোধূলিতে, আর এই দুই সন্ধ্যার মাঝে মধ্যাহ্নে। প্রাতঃ স্নানের কারণ, রাত্রির নিদ্রাকালে দেহের রন্ধ্রগুলি শিথিল হয়ে যায়, স্নান শরীরের সমস্ত ক্লেদ দূর করে পূজার যোগ্যতা দান করে।

জপ, স্তোত্রপাঠ ও প্রথাসিদ্ধ প্রণাম, এই হোল ওদের পূজা। যুক্তকরে সূর্যের দিকে মুখ করে দুই অঙ্গুষ্ঠে ভর দিয়ে সাষ্টাঙ্গে প্রণিপাত করা ওদের নিয়ম, সূর্য যে দিকে থাকে সেই দিকই ওদের 'কিবলা', কেবল দক্ষিণ দিক ছাড়া। ওরা দক্ষিণ দিকে মুখ করে কেবল নির্মাণ কর্ম ছাড়া কোনও পুণ্য কর্মই করে না, মধ্যাহ্নের পর সূর্যের নিম্নগতি আরম্ভ কালই (অপরাহ্ণ) হচ্ছে পরকালে সুপ্রতিফল পাওয়ার প্রশস্ত সময়, সেজন্য ব্রাহ্মণের সে-সময়ে শুচি ও পরিচ্ছন্ন থাকা কর্তব্য। সায়ংকালে ভোজন ও পূজার সময় স্নান না করেও এই দুটি কর্ম করার অনুমতি আছে। কাজেই দেখা যাচ্ছে, প্রথম ও দ্বিতীয় বারের স্নানের মত তৃতীয় বার স্নানের বিধান তেমন কঠোর নয়। তবে গ্রহণ কালে স্নান ব্রাহ্মণের অবশ্য কর্তব্য যাতে শাস্ত্রোক্ত অনুষ্ঠান ও যজ্ঞাদি সম্পন্ন করতে পারে। ব্রাহ্মণ আজীবন দৈনিক মাত্র দুইবার ভোজন করে—মধ্যাহ্নে ও সায়াহ্নে। ভোজনেচ্ছা হলে, সে প্রথমে একটি বা দুইটি লোকের উপযুক্ত অন্ন দান করার জন্য আলাদা করে রেখে দেবে, বিশেষ করে সন্ধ্যাকালে আগত অপরিচিত ভিক্ষার্থী ব্রাহ্মণের জন্য, কারণ অতিথি সৎকারে অবহেলা করা মহাপাপ; তারপর, অন্নের কিয়দংশ পশু, পক্ষী ও অগ্নির উদ্দেশ্যে রেখে দেবে। অবশিষ্টভাগ সে ভগবানের নামোচ্চারণ করে আহার করবে, যা উদ্বৃত্ত থাকবে তা গৃহের বাইরে রেখে দেবে, তার নিকটে আর যাবে না। কারণ তাতে আর তার অধিকার নাই। উদ্বৃত্ত অন্নটুকু ক্ষুধার্ত পথচারীর ভাগ, সে মানুষ, পশু, পক্ষী, কুকুর বা যাই-ই হোক না কেন। নিজস্ব ব্যবহারে জন্য ব্রাহ্মণের একটি পৃথক জলপাত্র থাকতে হবে; নিজস্ব না হলে তাকে ভেঙ্গে

ফেলে দিতে হবে। ভোজন পাত্রগুলি সম্বন্ধেও তাই নিয়ম। একজন ব্রাহ্মণকে দেখেছিলাম, যে তার আত্মীয়-পরিজনকে তার নিজের ভোজন পাত্রে খেতে দিয়েছিল, কিন্তু অন্য ব্রাহ্মণেরা তার এই কার্যের অতিশয় নিন্দা করেছিল।

'উত্তরে সিন্ধু নদী, আর দক্ষিণে চরণামৃত (? চর্ম্মতি ?) নদী, পূর্বে ও পশ্চিমে সাগর' এই চতুঃসীমানার মধ্যবর্তী ভূভাগে ব্রাহ্মণ বাস করতে বাধ্য, এই ভূ-ভাগ অতিক্রম করে তুরস্কদেশ ও বর্ণাটের দিকে যাওয়া তার জন্য নিষিদ্ধ। লোকে বলে, যে-দেশে ব্রাহ্মণের অঙ্গুলিতে পরিধেয় ঘাস জন্মায় না, কিংবা কৃষ্ণ হরিণ যে-দেশে নাই, সে-দেশে তার বাস করা নিষেধ। এটি আসলে উপরোক্ত সীমান্তর্গত ভূ-ভাগের বর্ণনা। সে-সীমানা অতিক্রম করলে ব্রাহ্মণ পাতকী হবে, তার প্রায়শ্চিত্ত করতে হবে।

যে-দেশে ভোজ্য দ্রব্যের জন্য নির্দিষ্ট (রন্ধনশালা) ঘরটি মাটি দিয়ে সম্পূর্ণ লিপ্ত নয়, এবং তার দরুণ প্রত্যেক ভোজকের জন্য তার সম্মুখ ভাগে জল ঢেলে গোময় লিপ্ত করে পৃথক পৃথক আসন তৈরী করতে হয়, সে-দেশে ব্রাহ্মণের জন্য প্রস্তুত আসনটি চতুষ্কোণ হওয়ার হেতু সম্বন্ধে তারা বলে থাকে যে, আহারের দরুণ স্থানটি অশুচি হয়ে যায়। শুচিতা ফিরিয়ে আনার জন্য আহারান্তে স্থানটি ধুয়ে মাটি দিয়ে লেপ করতে হয়। অতএব অশুচি স্থানটি যদি নির্দিষ্ট করে না দেওয়া হয়, তাহলে এইরূপ অন্য সব স্থানও অশুচি বলে সন্দেহ হবে।

শাস্ত্রে ব্রাহ্মণের জন্য পাঁচ প্রকারের উদ্ভিদ ভক্ষণ নিষেধ করা হয়েছে : পেঁয়াজ, রসুন, এক প্রকার লাউ (? ইঁচড় ?) 'গলিঞ্চ ('গুলঞ্চ ?) নামক গাজরের মত এক প্রকার লতা-মূল এবং ওদের পুষ্করিণীর ধারের একপ্রকার উদ্ভিদ শাক, যাকে ওরা "নালী" (?' নাল শাক ?) বলে।

॥ ব্রত-ধারণ ও উপবাস পালনের দিনক্ষণ ॥

পাঠকের মোটামুটি জেনে রাখা উচিত যে প্রতি মাসের শুক্লপক্ষের অষ্টম ও একাদশ দিবস উপবাসের দিন, কেবল অধিমাস ছাড়া, কারণ অধিমাস অশুভ বলে তাকে গণনায় ধরা হয় না।

একাদশ দিবসটি বাসুদেবের প্রিয়। তার কারণ, মথুরা অধিকার করার পর বাসুদেব যখন দেখলেন যে মথুরাবাসীরা প্রতি মাসে একদিন করে ইন্দ্রের পূজা করে, তখন তিনি তাদেরকে সে অনুষ্ঠানটি একাদশ দিবসে সরিয়ে নিয়ে গিয়ে তাঁর নামে পালন করতে বললেন। মথুরাবাসীরা তাই করল। তাতে ইন্দ্র রুষ্ট হয়ে প্রবল বৃষ্টিপাত করে প্লাবন সৃষ্টি করে গো-মহিষাদি সমেত তাদেরকে বিনাশ করতে উদ্যত হলেন। তখন বাসুদেব স্বহস্তে একটা পর্বত তুলে ধরে তাদেরকে রক্ষা করলেন। তাদের চতুর্দিকে জল প্রবাহিত হতে থাকল কিন্তু তাদের উপরে উঠ্‌ল না। অবশেষে ইন্দ্রের বিগ্রহটি অদৃশ্য হয়ে গেল। একটি নিকটস্থ পর্বতে মথুরাবাসীরা এই ঘটনার একটি স্মারক চিহ্ন স্থাপন করল। সেইজন্য ঐ দিনে শুচিশুদ্ধ হয়ে ওরা উপবাস পালন করে এবং একান্ত কর্তব্য মনে করে রাত্রি জাগরণ করে, যদিও তাতে বাধ্যবাধকতা নাই।

'বিষ্ণুধর্মে' লিখিত আছে "চন্দ্র যখন কৃষ্ণপক্ষের অষ্টমীতে রোহিণী (অর্থাৎ চতুর্থ) নক্ষত্রে অবস্থান করে, তখন 'জয়ন্তী' নামক উপবাসের দিন। সে দিবসে দান করলে সমস্ত পাপের প্রায়শ্চিত্ত হয়।"

দেখা যাচ্ছে উপবাস দিবসের ঐ বর্ণনা সকল মাসে প্রযুজ্য হতে পারে না, কেবল 'ভাদ্রপাদে' হতে পারে, যে মাসের অষ্টমীতে রোহিণী নক্ষত্রে বাসুদেবের জন্ম হয়েছিল। যে-হেতু অধিমাসের কারণে লৌকিক বৎসর ও চন্দ্রবৎসরের মধ্যে অগ্র-পশ্চাতের পার্থক্য থাকে সে-হেতু চন্দ্রের উপরোক্ত রোহিণী নক্ষত্রে অবস্থান ও কৃষ্ণপক্ষের অষ্টম দিবসের যোগাযোগ বহুবৎসরে একবার মাত্র হতে পারে।

উপরোক্ত 'বিষ্ণুধর্মে' আরো বলা হয়েছে—"শুক্লপক্ষের একাদশ দিবসে চন্দ্র যখন 'পুনর্বসু' (সপ্তম নক্ষত্র)-তে অবস্থান করে তখন [illegible] (? অওতজা)

নামক উপবাসের সময়; ঐদিনে কোনও পুণ্য কর্ম করলে ইচ্ছাপূরণের ক্ষমতা লাভ হয়, যেমন 'সগর' 'কুকুৎস্থ' ও 'দন্ধুমার'-এর হয়েছিল। ঐদিনে কৃত পুণ্যকর্মের ফলে তারা রাজ্য লাভ করেছিল"। চৈত্র মাসের ষষ্ঠদিবস সূর্যের নামে ব্রত পালনের জন্য নির্দিষ্ট।

'আষাঢ়ে' চন্দ্র যখন 'অনুরাধা' নক্ষত্রে অবস্থান করে (সপ্তদশ ক্ষেত্র) তখন বাসুদেবের উদ্দেশ্যে ব্রত পালনের দিন। তার নাম دیوسینی (? দেবাসিনি) অর্থাৎ নিদ্রিত দেবতা। যে চারমাস কাল বাসুদেব নিদ্রিত থাকেন ঐ'টি হচ্ছে তার প্রথম দিন। কারো কারো মতে দিনটি মাসের একাদশী হতে হবে, অবশ্য এই রকম দিন প্রতি বৎসরে পাওয়া যায় না। বাসুদেবের ভক্তরা সেদিনে মাছ-মাংস ও মিষ্টান্ন পরিহার করে, স্ত্রী-সহবাস থেকে বিরত থাকে, অহোরাত্রে একবার মাত্র আহার করে, অনাবৃত ভূমিতে শয়ন করে, কোনও খাট বা পালঙ্ক ব্যবহার করে না। লোকে বলে 'এই চার মাস দেবতাদের রাত্রিকাল; গোধূলি সন্ধ্যার জন্য তার আগে আর একমাস, আর প্রদোষ সন্ধ্যার জন্য পরে আর একমাস তার সঙ্গে যোগ করতে হবে। কিন্তু সূর্য তখন কর্কট রাশির আদিতে থাকে তখন দেবলোকের মধ্যাহ্নকাল।' এই দুই সন্ধির সাথে চন্দ্রের সম্বন্ধ কেমন করে হবে, আমি বুঝতে পাচ্ছি না।

'শ্রাবণ পূর্ণিমার দিন সোমনাথের নামে উপবাসের জন্য নির্দিষ্ট।

'অশ্বযুথ' (আশ্বিন) মাসে যেদিন চন্দ্র 'আল্‌সারাতানে' আর সূর্য কন্যারাশিতে প্রবিষ্ট হয়, সেদিন উপবাস করতে হয়। ঐ মাসের অষ্টম দিবস 'ভাগবত' ব্রতোপবাসের দিন, চন্দ্রোদয়ের সাথে সে উপবাস শেষ হয়। 'ভাদ্র' মাসের পঞ্চম দিবসে ষট্ নামে সূর্যের উদ্দেশ্যে আর একটি ব্রতোপবাস আছে। তাতে ওরা সূর্যের কিরণ মালার অর্চনা করে। গবাক্ষ দিয়ে যে-সব কিরণরশ্মী ঘরে প্রবেশ করে ওরা নানারূপ গন্ধ দ্রব্য ও সুবাসযুক্ত পত্রপুষ্প স্থাপন করে তাকে অভিনন্দিত করে।

এই মাসেই চন্দ্র যেদিন রোহিণী নক্ষত্রে থাকে সেদিন বাসুদেবের জন্ম তিথির উপবাস। কেউ কেউ এই ব্রতের দিন নির্ণয়ের জন্য কৃষ্ণপক্ষের অষ্টম দিনের শর্ত যোগ করে দেয়। আমরা কিন্তু আগেই দেখিয়েছি যে এই

রকমবিশেষ দিন প্রতি বছরে আসে না। অনেক বৎসর পরে একবার সেরূপ যোগাযোগ হয়।

কার্তিক মাসে, চন্দ্রের শেষ নক্ষত্র 'রেবতী'তে অবস্থান কাল বাসুদেবের নিদ্রা ভঙ্গের উপবাসের দিন। তার নাম "দেবোত্থিনি" অর্থাৎ দেবতার উত্থান। কেউ কেউ সে-দিনটি শুক্লপক্ষের একাদশী হওয়াও আবশ্যক মনে করে। সেদিন ওরা শরীরে গোময় মাখে। দুগ্ধ মিশ্রিত গোময় ও গোমূত্র পান করে। উপবাস ভঙ্গ করে। ঐ দিনটি 'ভস্ম পঞ্চরাত্রি' নামিত পাঁচ দিনের প্রথম দিবস। তাতে বাসুদেবের নামে ওরা উপবাস পালন করে; দ্বিতীয় দিনে ব্রাহ্মণরা সে উপবাস ভঙ্গ করে, তার পরে অন্যেরা।

পৌষমাসের ষষ্ঠ দিবসে সূর্যের নামে আর একটি ব্রত আছে। আর 'মাঘ' মাসের তৃতীয় দিবসে কেবল স্ত্রীদের পালনীয় একটি ব্রত আছে, পুরুষদের জন্য নয়। তাকে 'গৌরতৃ' (? গৌরী-তৃতীয়া) বলা হয়। এর উপবাস দিন ও রাত্রি ব্যাপী প্রভাত হলে স্ত্রীলোকেরা তাদের নিকটতম আত্মীয়দের উপঢৌকন দেয়।

॥ পার্বণ ও উৎসব ॥

শুভক্ষণে অন্যত্র গমন করার নাম যাত্রা; সে জন্য পার্বণকে যাত্রা বলা হয়। পার্বনের বেশীর ভাগই স্ত্রীলোক ও শিশুদের দ্বারা অনুষ্ঠিত হয়।

চৈত্র মাসের দ্বিতীয় দিনে কাশ্মীরীদের একটি পার্বন আছে। তার নাম 'আগদোশ' (اگدوش)। এটি 'মুতই' নামক এক কাশ্মীরী রাজার তুরস্কদের উপর জয়লাভের স্মারক উৎসব। ওদের বিশ্বাস মতে সে-রাজা পৃথিবীর অধীশ্বর ছিল; অবশ্য, প্রায় ভারতীয় সব রাজা সম্বন্ধেই এই রূপ ধারণা করা ওদের অভ্যাস। তবে, যেমন আমি আগে বলেছি, সে রাজার কাল বর্ণনা ওরা এমন ভাবে করে, যার থেকে ওদের মিথ্যা ধরা পড়ে যায়। অবশ্যই ইউনানী, রোমক, ব্যাবিলনী বা পারসিকদের মত হিন্দুদেরও সাম্রাজ্যের অধিকারী হওয়া যে অসম্ভব, তা নয়। কিন্তু আমাদের নিকটবর্তী কালের ইতিহাস বা সংবাদ'ত আমাদের কাছে নিশ্চিত তথ্যের মত (সুবিদিত)। এমনও হতে পারে, যে উক্ত রাজা সমস্ত ভারবর্ষের

অধিপতি ছিল। আর ওরা ভারতবর্ষ ও হিন্দু জাতি ছাড়া অন্য দেশ বা অন্য জাতির কোনও সংবাদই রাখে না।

চৈত্র মাসের একাদশ দিবস 'হিন্দোলি চৈত্র' বলা হয়। সেদিন বাসুদেবের দেউলে ওরা সমবেত হয়ে তার বিগ্রহকে দোলায় রেখে, শৈশবে যেমন তাঁকে দোলান হত, সেই রকম দোলা দিতে থাকে। ওরা সমস্ত দিন ধরে নিজ গৃহেও এই রকম দোল খেলে এবং আমোদ প্রমোদ করে।

চৈত্র পূর্ণিমার দিনে 'বসন্ত' নামক নারীদের একটা উৎসব আছে, যাতে তারা অঙ্গসজ্জা ও বেশভূষা করে পতিদের কাছ থেকে উপহার চায়। চৈত্র মাসের ২২ তারিখকে বলা হয় ('চৈত্র চস্‌তি'?) আনন্দ উৎসবের, 'ভগবতীর' নামে উদ্দিষ্ট। সেদিন স্নান ও দান করা হয়।

বৈশাখ মাসের তৃতীয় দিবস নারীদের উৎসব, তার নাম 'গৌরতৃ' (গৌরী-তৃতীয়া?); অর্থাৎ 'হিমবন্ত' পর্বত কন্যা, মহাদেবের স্ত্রী, গৌরীর নামাঙ্কিত সেদিন স্ত্রী লোকেরা স্নান করে অলঙ্কার ও বেশভূষায় সজ্জিত হয় এবং গৌরীর প্রতিমা পূজা করে, প্রদীপ জ্বেলে ধূপচন্দনাদি দিয়ে তার অর্চনা করে। সমস্ত দিন উপবাস করে এবং ঝুলন খেলে। পরদিন দানান্তে অন্নগ্রহণ করে।

বৈশাখ মাসের দশমদিনে রাজার নিযুক্ত ব্রাহ্মণরা উন্মুক্ত মাঠে চলে গিয়ে পূর্ণিমা পর্যন্ত পাঁচদিন ব্যাপী যজ্ঞানুষ্ঠানের জন্য বিরাট বিরাট অগ্নি জ্বালে; চারি ভাগে ভাগ করে ষোলটি পৃথক স্থানে অগ্নি জ্বালানো হয়। প্রতি ভাগে একজন ব্রাহ্মণ যজ্ঞের পৌরোহিত্য করে, যাতে বেদের সংখ্যানুযায়ী চার জন পুরোহিত-ই যজ্ঞে অংশ গ্রহণ করে। ষোড়শ দিবসে তারা প্রত্যাবর্তন করে।

এই বৈশাখ মাসেই মহাবিষুবসংক্রান্তি হয়, যার নাম বসন্ত। সংক্রান্তি দিনটি ওরা গণনা করে নির্ধারণ করে এবং সেদিন আনন্দ উৎসব করে কাটায় ও ব্রাহ্মণ ভোজন করায়।

জ্যৈষ্ঠ মাসের প্রথম অর্থাৎ অমাবস্যাও ওদের উৎসবের দিন। সুফলের আশায় সেদিন ওরা কৃষিজাত প্রথম শস্য জলকে নিবেদন করে। এই মাসের পূর্ণিমা স্ত্রীদের উৎসবের দিন। তার নাম 'রূপ-পঞ্চ'।

আষাঢ় মাসের সব দিনগুলি দান দক্ষিণার জন্য উৎসর্গীকৃত। সে দানকে 'আহারি' বলা হয়। ঐ মাসে বাস-গৃহের সমস্ত তৈজসপত্রের নবায়ণ হয়। শ্রাবণ পূর্ণিমার দিন ব্রাহ্মণ ভোজন করান হয়।

'অশ্বৌযুথ' মাসের অষ্টম দিনে, চন্দ্র যখন উনবিংশ বা 'মূলা' নক্ষত্রে থাকে, তখন ইক্ষুর নাল চোষা আরম্ভ হয়। এটি বাসুদেব ভগ্নী 'মহানবমী'র (مها نفمی ?) নামে অনুষ্ঠিত উৎসব, ঐদিন ওরা শর্করা ও অন্যান্য শস্যের প্রথম লব্ধ ফল তাঁর 'ভগবতী' নামিত বিগ্রহকে নিবেদন করে। তার সমক্ষে প্রচুর দান করে ও বহু ছাগ বলি দেয়। বিগ্রহকে নিবেদন করার মত যার কিছুই নাই সে কোথাও না বসে, সর্বদা বিগ্রহের নিকট দাঁড়িয়ে থাকে। এবং কখনও কখনও অতর্কিত ভাবে যাকে সম্মুখে পায় তাকে হত্যা করে।

(অশ্বৌযুথের) পঞ্চদশ দিবসে, চন্দ্র যখন তার শেষ নক্ষত্র 'রেবতী'তে অবস্থান করে তখন 'পুহায়া' (ی هاپ) নামক পর্ব। সেদিন ওরা নিজেদের মধ্যে মল্লযুদ্ধ ও পশুদের সঙ্গে খেলা করে আমোদ উপভোগ করে। পর্বটি বাসুদেবের নামে পালিত হয়, কারণ তাঁর মাতুল কংস তাঁকে মল্লযুদ্ধের জন্য আহ্বান করেছিল।

ষোড়শ দিনে একটি পর্ব আছে, তাতে ব্রাহ্মণকে দান করতে হয়। ত্রয়োবিংশ দিবসে 'আশুক' (اشوک) নামে পর্ব আছে, তাকে 'আহুই' (? هوی)-ও বলা হয়। সেদিন চন্দ্র সপ্তম নক্ষত্র 'পুনর্বসু'তে অবস্থান করে। এটিও আমোদ প্রমোদ ও মল্লক্রীড়ার দিন।

'ভাদ্রপাদে', চন্দ্র যখন দশম নক্ষত্র 'মঘা'তে অবস্থান করে, তখন ওরা 'পিতৃপক্ষ' নামক একটি পর্ব পালন করে। পিতৃপক্ষের, অর্থ পিতৃগণের অর্ধমাস, কারণ চন্দ্র অমাবস্যার কাছাকাছি সময়ে এই নক্ষত্রে প্রবেশ করে। এই পক্ষকাল ধরে ওরা পিতৃগণের নামে দান দক্ষিণা করে।

ভাদ্রপাদের তৃতীয় দিনে "হরবালি" (هربالی) নামক স্ত্রীদের আর একটি পর্ব আছে। তার রীতি হচ্ছে যে পর্বের কয়েকদিন পূর্বে ঝুড়িতে বিভিন্ন প্রকারের বীজ বপন করা হয়। এবং অঙ্কুরোদ্গম হলে পর্বের দিন সে ঝুড়িগুলি নিয়ে এসে তাতে ফুল ও সুগন্ধি ছড়িয়ে এবং সারারাত্রি খেলা ধূলায়

কাটিয়ে প্রভাতে বীজগুলিকে পুষ্করিণীতে নিয়ে ধৌত করা হয়। এবং স্নানান্তে দান করতে হয়।

ভাদ্রপাদের ষষ্ঠ দিবসের নাম (گهت) 'গায়হত্' (?), সেদিন বন্দীশালার অবরুদ্ধ বন্দিগণকে অন্ন বিতরণ করা হয়। এই মাসের অষ্টম দিবসে চন্দ্রের অষ্টকলা পূর্ণ হলে (دروبهر) 'দ্রুবহর' (? দ্রৌধহর?, ধ্রুবগৃহ?) নামক একটি পর্বানুষ্ঠান হয়। সেদিন ওরা স্নান করে ও সুপুষ্ট শস্যবীজ ভক্ষণ করে যাতে তাদের সন্তানরা স্বাস্থ্যবান হয়। স্ত্রীলোকেরা গর্ভবতী হলে এবং সন্তান কামনা করলে এই অনুষ্ঠান পালন করে।

ভাদ্রপাদের একাদশীকে 'পার্বতী' (پربت) বলা হয়। এটি আসলে একটি সুতার নাম যা ঐ উদ্দেশ্যে আনিত উপাদান থেকে পুরোহিতরা তৈরী করে দেয়। তার একাংশ তারা বাসন্তী রঙে রাঙায়। অপর অংশে কোন রঙ মাখায় না। সুতাটি বাসুদেব মূর্তির দৈর্ঘ্যের সমান করে তৈরী করে। সেটিকে তারপর নিজ কাঁধের উপরে এমন ভাবে রাখে যাতে সেটি পায়ের পাতা পর্যন্ত পৌঁছায়। এটি অতি সম্মানিত পর্ব। ভাদ্রপাদের ষোড়শ দিবস কৃষ্ণপক্ষের প্রথম দিন হচ্ছে (کراہ) 'কারারহ্' (?) নামক সপ্তাহের প্রথম দিন। এই পর্বে শিশুদিগকে বেশভূষায় সজ্জিত করে আদর করা হয়; এবং তারা নানাপ্রকারের পশুদের সাথে খেলা করে। সপ্তম দিনে পুরুষরাও সুবেশ পরে আমোদ প্রমোদে যোগ দেয়। মাসের অবশিষ্ট ভাগে ওরা প্রতি সায়াহ্নে শিশুদিগকে সুবস্ত্র পরায়, ব্রাহ্মণদিগকে দক্ষিণা দেয় ও সৎকর্ম করে।

চন্দ্র যখন তার চতুর্থ নক্ষত্র, 'রোহিণী'তে অবস্থান করে, সে সময়কে ওরা (گونا لهيد?) "গুনালহীদ" (?) বলে। তখন তিন দিন ব্যাপী ওরা পর্বানুষ্ঠান করে। খেলাধূলা আমোদ-প্রমোদ করে ও বাসুদেবের জন্মোৎসব পালন করে।

জীবশর্মা বলেছেন, কাশ্মীরবাসীরা এই মাসের ২৬শ ও ২৭শ দিবসে 'গনাহ' (?گنه) নামক এক প্রকার কাঠের ভেসে-আসাকে উপলক্ষ করে একটি পর্বানুষ্ঠান করে থাকে। ঐ কাঠগুলি উক্ত দুই দিনে 'অধিষ্ঠান' নামিত নগরের মধ্য দিয়ে বিতস্তার স্রোতে ভেসে আসে। লোকে বলে:

মহাদেব সেগুলিকে পাঠান। ওরা বলে, সে পর্বের একটা বিশেষত্ব হচ্ছে যে যত চেষ্টাই হোক না কেন, কেউ সে কাঠগুলিকে ধরতে পারে না। সর্বদাই সেগুলি হাত এড়িয়ে দূরে সরে যায়। কাশ্মীরীদের মধ্যে যাদিগকে আমি এবিষয়ে জিজ্ঞাসাবাদ করেছি, তারা স্থান ও কাল সম্বন্ধে কিন্তু অন্য কথা বলেছে। তারা বল্লে যে এ ব্যাপারটি ঘটে উপরোক্ত নদী-(বিতস্তা)র উৎসের পাশে অবস্থিত (كوديشهر Kudaishahr ?) 'কূদায়শহর' নামক পুষ্করিণীতে এবং তার সময় হচ্ছে বৈশাখ মাসের মাঝামাঝি। এইটিই বেশী সম্ভব বলে মনে হয়। কেননা বৈশাখ মাস জল বৃদ্ধির সময়। ব্যাপারটির জুরজান (جرجان) নদীতে ভেসে-আসা কাষ্ঠ বিশেষের সাথে যেন সাদৃশ্য আছে; যা নদীর উৎসে জল বৃদ্ধি হলে দেখা যায়।

জীবশর্মা আরও বলেছেন সোয়াত, দেশে 'গিরি' পার্শ্ববর্তী পর্বতাঞ্চলে একটি উপত্যকা আছে যেখানে ৫৩টি নদী এসে মিলিত হয়েছে। স্থানটিকে 'ত্রঞ্জাই' (ترجائی ?) বলা হয়। উপরোক্ত দুই দিন সে উপত্যকার জল শ্বেতবর্ণ ধারণ করে। তার কারণ হিসাবেও বলে যে মহাদেব তখন সে জলে স্নান করেন।

কার্তিক মাসের প্রথম, অর্থাৎ অমাবস্যার দিন, সূর্য যখন তুলা রাশিতে থাকে সে দিনকে 'দীপালি' (دیالی ?) বলা হয়। তখন লোকেরা স্নান করে। সুবেশ পরিধান করে। পরস্পরকে পান-সুপারি দেয়। দান করার জন্য শকটারোহণ করে মন্দিরে যায় এবং দ্বিপ্রহর পর্যন্ত আমোদ-আহ্লাদ করে। এবং রাত্রে প্রত্যেক স্থানে বহু সংখ্যক প্রদীপ জ্বালায়। তাতে দশদিক আলোকিত হয়ে যায়। এই উৎসবের ইতিবৃত্ত এই, বাসুদেব পত্নী লক্ষ্মী সারাবৎসরের ঐ এক দিন মাত্র ধরণীর সপ্তম স্তরে অবরুদ্ধ বিরোচনপুত্র বলিরাজাকে ছেড়ে দেয় ও তাকে পৃথিবীতে আসার অনুমতি দেয়। এ পর্বকে সে-জন্য 'বলিরাজ' নাম দেওয়া হয়েছে, অর্থাৎ বলির আধিপত্য। ওরা মনে করে যে, কৃতাযুগে এই সময়টি মঙ্গলযুক্ত ছিল। আমাদের এই দিনটি কৃতাযুগের সেই সু-দিনের মত বলে আমরাও আনন্দ করছি।

কার্তিকের পূর্ণিমাতে ওরা লোকজনকে নিমন্ত্রণ করে ভোজন করায় এবং কৃষ্ণপক্ষের প্রতিদিন স্ত্রীলোকদিগকে বসন-ভূষণে সুসজ্জিত করে।

মার্গ শীষের তৃতীয় দিনকে (Guvan-beatrij گوبن باتريج ?) "গুবান্ বাত্রিজ" বলা হয়। এ দিনটি স্ত্রীদের পালনীয় গৌরীব্রতের (گور) দিন। ধনী ও সম্পন্ন গৃহিণীদের ঘরে অন্য স্ত্রীলোকেরা সমবেত হয় এবং রৌপ্য-নির্মিত অনেক-গুলি গৌরী মূর্তি আসনে স্থাপন করে ধূপধুনা দিয়ে তাকে অর্চিত করে। এরং সারারাত্রি ধরে নিজেদের মধ্যে আমোদ প্রমোদ ও খেলাধূলা করে। প্রাতে দান করে।

ঐ মাসের পূর্ণিমাতে স্ত্রীদের আর একটি পর্ব আছে। পৌষ মাসের প্রায় সবদিনেই ওরা (پوهرل) 'পুহারল' (?) নামক এক প্রকার মিষ্টান্ন প্রচুর পরি-মাণে তৈরী করে।

শুক্ল পক্ষের অষ্টম দিনে, যাকে 'অষ্টক' (اشتک) বলা হয়। ওরা ব্রাহ্মণ-দিগকে আমন্ত্রণ করে "বাস্ত" (باست ?) নামক এক প্রকার সব্জী (আরবীতে যার নাম سرمق)—দিয়ে প্রস্তুত অন্ন ভোজন করায় ও আদর যত্ন করে। কৃষ্ণপক্ষের অষ্টম দিনে—যাকে ('সাকারতম্' ? ساکارتم) বলা হয়—ওরা 'সলিগম' ভক্ষণ করে।

মাঘ মাসের তৃতীয় দিবসকে 'মহত্রিজ' (? ماهتريج মাঘ তৃতীয়া ?) বলা হয়। এটি স্ত্রীদের গৌরীব্রতের দিন। বিশিষ্ট কোন গৃহিণীর ঘরে গৌরী মূর্তির সম্মুখে ওরা সমবেত হয়ে নানা প্রকার মূল্যবান বস্ত্র, গন্ধ-দ্রব্য ও সুস্বাদু খাদ্য তার সম্মুখে স্থাপন করে। এইরূপ প্রত্যেক সমাগমে ওরা ১০৮ টি পূর্ণ কলস স্থাপন করে। জল শীতল হলে সেই জলে রাত্রির চার প্রহরে চার বার স্নান করে। পরদিন দান করে, এবং লোক নিমন্ত্রণ করে ভোজন করায়। এই মাসের সব দিনই—স্ত্রীরা শীতল জলে স্নান করে। এই মাসের শেষ দিনে অর্থাৎ ২৯ তারিখ, রাত্রি যখন আর মাত্র দেড় ঘণ্টা বাকী থাকে, তখন নারী-পুরুষ সবাই জলে নেমে সাতবার ডুব দেয়।

মাঘের পূর্ণিমাতে যাকে (چاما ؟) 'চামাহ' বলা হয়—প্রত্যেক উঁচু জায়গাতে ওরা প্রদীপ জ্বালায়। ২৩ তারিখে যাকে—"মানসর্তক" আর "মাহাতন্"

(ما ها تن-ما نشر تک) দুই-ই বলা হয়—ওরা নিমন্ত্রিত লোকদিগকে মাংস ও বড় আকারের এক প্রকার কালো রঙের ছোলার ব্যঞ্জন ভোজন করায়।

ফাল্গুন পূর্ণিমাতে "ওদাদ" (؟) অথবা (دهولا) "ধৌলা" (দোলা) নামক নারীদের একটি বিশেষ পর্বানুষ্ঠান হয়। "চামাহ" পর্বে যে-সব স্থানে প্রদীপ জ্বালানো হয়, 'ধৌলা' পর্বে সেদিন তার নিম্নতর স্থানে ওরা অগ্নি জ্বালায় এবং সেগুলিকে অবশেষে গ্রামের বাইরে নিয়ে ফেলে দেয় তার পরের রাত্রি, অর্থাৎ ষোড়শ দিবস—যাকে "শিবরাত্রি" বলা হয়।

ওরা সারারাত্রি মহাদেবের পূজা করে রাত্রি জাগরণ করে। নিদ্রা যায় না এবং মহাদেবকে ফুল ও ধূপ ধুনার নৈবেদ্য দেয়।

২৩শে ফাল্গুনের পর্বে যার নাম (پو ؟) "পুইয়াওন্"—ওরা ঘৃত ও শর্করা দিয়ে প্রস্তুত তণ্ডুল ভক্ষণ করে। মুলতানের হিন্দুরা 'সম্বপুর যাত্রা' (سمانب پو زاتر) নামক একটি উৎসব পালন করে। সূর্যের সম্মানে এই উৎসবটির আয়োজন করা হয়। উৎসবের দিন নির্ধারণ এই ভাবে হয় 'খণ্ডখাদ্যক' অনুযায়ী প্রথমে "অহর্গন" নির্ণয় করে তার থেকে ৯৮০৪০ বিয়োগ করে, অবশিষ্টকে ৩৬৫ দিয়ে ভাগ করে ভাগফলকে অগ্রাহ্য করা হয়। ভাগশেষে যদি কোনও সংখ্যা অবশিষ্ট না থাকে তাহলে ভাগফল হবে এই উৎসবের তারিখ। আর ভাগশেষে কিছু অবশিষ্ট থাকলে তা'হবে বিগত উৎসব থেকে অতীত দিবস সংখ্যা। ৩৬৫ থেকে সে দিবসগুলি বাদ দিলে আগামী উৎসবের তারিখ পাওয়া যাবে।